নীতি-দুর্নীতি ও বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ

(পত্রিকার প্রকাশিত হেডলাইন: কোবাদ আলীর এমন দশাই হয়েছিল)

আমি সমাজবিজ্ঞানী নই, সমাজদর্শক; তাই সমাজকে দু-চোখ ভরে আমার মতো করে দেখতে চাই। এবারের বাজেট নিয়েও একটু ভিন্ন ধাঁচের আলোচনায় যেতে চাই। প্রথমে একটা গল্প সংক্ষেপে বলি। আমাদের পাশের গ্রামের এক পরিবারের অতীত কথা। পরিবারপ্রধানের নাম কোবাদ আলী মণ্ডল। মাঠে বেশ ক'বিঘা জমি। বিয়ের পরে পর পর চার ছেলের গর্বিত পিতা। ছেলেদের শিক্ষার কোনো নামগন্ধ নেই। তারা যত বড় হতে লাগলো, মাঠে লাঙলের সংখ্যা তত বাড়তে লাগলো। গ্রামের এক মাতব্বর কোবাদের উন্নতি দেখে সুপরামর্শ দিল– 'কোবাদ, তুমি আরেকটা বিয়ে কর, তোমার একসঙ্গে চারটা লাঙল মাঠে চলে, তোমার আরও লোক দরকার'। কোবাদ গোপনে তা-ই করল। বছরখানেক পর সুযোগ মত দ্বিতীয় বউকে ঘরে তুলে নিল। দুই বউ মিলে কোবাদের সাত ছেলে তিন মেয়ে। সোনার সংসারে কোবাদের পা আর মাটিতে পড়ে না। দুই বউয়ের ছেলেমেয়েদের দুর্মতিতে ধরলো, কারো সঙ্গে কারও বনিবনা নেই। বড় ছেলে ক্ষেতে ধান বোনার জন্য দুই ধামা বীজ বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। জমিতে এক ধামা বোনা হয়। আরেক ধামা বীজ পথ থেকে উধাও। বীজ বিক্রির টাকা বড় ছেলের নামে জমা হয় মাতব্বরের কাছে। ফসলের চারা গজালে বোঝা যায় ধানগাছ হয়েছে ফাঁকা ফাঁকা। ছেলে পাঁড়ায় মুখচাপা দেয় 'ধানের বীজ সবটা গজায়নি'। কী আর করা! গ্রামের দুই মাইল দূরে সপ্তায় দু-দিন হাট বসে। দ্বিতীয় বৌয়ের ছেলেটা হাটে বাজার করতে যায়। ধান বেচে বাজার। দুই মন ধান বাজারে নিয়ে গেলে মেপে হয় তিন মন। এক মন ধানের টাকার হিসেব কেউ জানে না। বাজার-খরচ বেশি বেশি দেখিয়ে সংসার ফাঁকির টাকা আরেক মাতব্বরের কাছে জমা হয়। ক্ষেতের ফসল খামার থেকে বিক্রি হয়ে ছেলেদের পকেট ভারী হতে লাগলো। সংসারে উড়নচণ্ডে দশা। দিনে দিনে মাঠে লাঙলের সংখ্যা কমতে লাগলো। আয়ে ঘাটতি, ব্যয় অতিরিক্ত। মাথাভারী সংসার। সংসারে যে যেখানে পারে নিজের পকেট ভারী করে। বড় মেয়ে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে দুই মেয়ে নিয়ে বাপের সংসারে ফিরে এসেছে। সংসারে প্রতি ওক্তে পাত পড়ে ১৮টি। কোবাদ আলী ক্রমেই ঋণে জর্জরিত হতে লাগলেন। মাঠের জমিগুলো পালাক্রমে মাতব্বর দুজনের কাছে বিক্রি হয়ে গেল। কোবাদ আলী রোগাক্রান্ত হয়ে কিছুদিন বিছানায় থেকে মারা গেলেন। এক বছরের মধ্যে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ প্রকাশ্য রূপ নিল। মাতব্বররা গিয়ে সবাইকে পৃথক করে দিল। প্রত্যেকের কাঁচি-মাথাল ও দিন-মজুরি সম্বল। কারও দিন থেমে নেই, প্রকৃতির নিয়ম মতো সামনে এগিয়ে চলেছে।

এবারের বাজেট নিয়ে অনেক কথাই পড়লাম ও জানলাম। অত উপাদানের ব্যাখ্যা এত ছোট্ট পরিসরে লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একটা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সামান্য একটা অংশ জুড়ে বাজেট। আমি জানি, বাজেট একটা দেশের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার স্বল্পমেয়াদী অংশ। এক বছরের জন্য প্রস্তুতকৃত বাজেটে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দিক-নির্দেশনা থাকে। এদেশের বাজেটে দিক-নির্দেশনার বিস্তারিত আলোচনা থাকে না বলেই আমি বাজেটকে কোন কোন পণ্যের বা সেবার উপর কর বা শুল্ক বাড়বে অথবা কমবে তার একটা তালিকা বলে থাকি। পত্রিকা অফিসগুলোও সেভাবেই বাজেটকে প্রকাশ করে। আমাদের দেশে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যুতসইভাবে করতে নেই। নামমাত্র একটা করা লাগে, তাই আমরা একটা করে দেখাই। কারণ এদেশে নূন আনতে পান্তা ফুরায়। পাঁচ বছরের প্রজেক্ট শেষ করতে দশ-পনেরো বছর সময় লাগে। এ সবই বাস্তবতা। আমাদের বর্তমান বড় পরিকল্পনা '২০৪১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন পূরণের অঙ্গীকার' সামনে রেখে করা হচ্ছে বলা হলেও বাজেটের মধ্যে সে অঙ্গীকারের ছিটেফোঁটা অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। বয়সের ভারে চোখে কম দেখি অথবা এটা কাগুজে অঙ্গীকারও হতে পারে। তবে আগেই বলেছি, বাজেট তো আর সামগ্রিক অর্থনীতির সবটুকুই নয়, সেজন্য সরকারের আলাদা কোনো শুভ পরিকল্পনা থাকতেও পারে, যা 'সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত' বাংলাদেশ গড়ায় কাজে লাগবে।

প্রস্তাবিত বাজেটে প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করারোপের দিকে বেশি ঝুঁকতে দেখা গেছে। এ কর চাপানো ও আদায় অতি সহজ। এতে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে করের অভিঘাতে নিষ্পেষিত হতে হবে। এটা প্রগ্রেসিভ কর-নীতির খেলাপ। এদেশের মানুষ তো ভারবাহী ট্রাকের মতো; ফলে করের এ নিষ্পিষ্ট ভার দলমত নির্বিশেষে তারা বিনা বাক্যব্যয়ে বইতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। বরং ট্রাকে ভার কম চাপালে ধিতাং ধিতাং নাচতে নাচতে পথ চলে। যেটা দৃষ্টিকটু লাগে। বর্তমান সরকার '৯৬ সালে একবার ক্ষমতায় এসেছিল; ২০০৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ক্ষমতায় আছে। অতীতের যে কোনো বছরের বাজেটের সাথে এ বছরের বাজেটের পাশাপাশি তুলনা করলে তারা নিজেরাই পার্থক্যটা ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবেন। আমার বিশ্বাস পরোক্ষ করের বোঝা চাপিয়ে আবার অন্যান্য ফ্যাক্টরকে কর্মশীল রেখে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা অতটা সহজ হবে না। এর সাথে ডলারের বিপরীতে টাকার দরপতন তো আছেই। মাত্র এক বছর তো; এরই মধ্যে বাস্তবতা ফুটে উঠবে। প্রত্যক্ষ কর চাপিয়ে আদায় করা খুব কঠিন। যারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কিংবা সততা দেখিয়ে সঠিক পরিমাণে আয়কর দেন, সমাজের চোখে তারা বোকা। যে-সব প্রতিষ্ঠানে উৎস স্থলে কর কেটে নেয়, কর্মকর্তারা কর দিতে বাধ্য হন– এরাও মহা বিপদে। ত্রিশ শতাংশ টাকা কর্তন করে এদের ক্রয়ক্ষমতা সত্তর টাকায় নামিয়ে আনা হয়। এরা কর ভারে নিষ্পেষিত। অধিকাংশ কোম্পানিতে দুটো বিকল্প হিসাবের খাতা তৈরি করে কর্মকর্তাদের করভারকে অনেকটাই লাঘব করা হয়। এদের নামমাত্র কর দিতে গায়ে লাগে না। এছাড়া অবৈধ রোজগারকারীদের পোয়াবারো। কর নেই; কোনো আইনে অবৈধ রোজগারে ধরা খাওয়ার ভয়ও নেই। এরাই এদেশের করিতকর্মা ও সুযোগ্য নাগরিক। তাই বলছিলাম, প্রত্যক্ষ কর আদায় বিষয়টা এত সহজ নয়। যে হতভাগারা কর দিচ্ছেন, সরকার সুযোগমতো তাদের ঘাড়ে আরো করের বোঝা কিভাবে চাপানো যায় তার মওকা খোঁজে। নীতিটা হচ্ছে– 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'। অধিকাংশ ব্যবসায়ী দুটো হিসাবের খাতা তৈরি করে, কিছু খরচপাতি করে করের অঙ্ক ছোট করে ফেলেন। দিনে দিনে টেকসই কৌশল আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। তবে আমার মতো পেশাদার হিসাববিজ্ঞানীদের কাছে দেশের আর্থিক বাস্তবতা ঢাকা, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার শামিল। আমদানী-রপ্তানী ব্যবসাতে আন্ডার ইনভয়েসিং, অবৈধ লেনদেন ও শুল্ক ফাঁকির যথেষ্ঠ ব্যবস্থা আছে, আছে কালোবাজারি। ব্যবসায়ীরা সে সুযোগ উপযুক্তভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। তাহলে সরকারি কোষাগারে টাকা আসবে কোত্থেকে! একমাত্র সম্বল আইনের সুষ্ঠু ব্যবহার, যা এদেশে বিরল। আমাদের পরিকল্পনার বড় দোষ হচ্ছে লিকেজগুলো মেরামত না করে পানি ঢেলে ড্রাম ভরার নিষ্ফল চেষ্টা করা। এদেশে জন্ম নিয়ে কর আইন মান্য করা এবং সততা দেখানো নিজে নিজের ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনার শামিল। এদের হতভাগা বলা ছাড়া নতুন কোনো শব্দ এ মুহূর্তে মাথায় আসছে না।

বাজেট শুধু বছরের প্রথমে আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনাই নয়, প্রশাসকের হাতে সারা বছরের আর্থিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণও বটে। এদেশে এই নিয়ন্ত্রণের দিকটা পুরোপুরি উপেক্ষিত। রাজস্ব খাতে যে ব্যয় হচ্ছে, সেখান থেকে দেশ সমপরিমাণ সেবা পাচ্ছে না। আবার উন্নয়ন বাজেট ব্যয়ও ভীষণভাবে অনিয়ন্ত্রিত, যা দেশবাসী কেবলই অনিমিষচোখে দেখছে। 'মঘা, এড়াবি কয় ঘা'! দেশের কোষাগার থেকে উন্নয়ন ব্যয়ের নামে খরচ হচ্ছে একশ টাকা, দেশ অর্জন করছে একশ টাকার অনেক অনেক কম মূল্যের সম্পদ; বাকিটা সিস্টেম লস। এ সমীকরণ মেলাতে চেষ্টা করা ভাঙা একতারায় বেসুর বোলে সুর সাধার শামিল। গত পাঁচ-ছয় দিন আগে 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় একটা খবর পড়লাম। আমাদের দেশে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো রাশিয়া ভারতেও একই আকারের আরেকটা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করে দিচ্ছে। খরচ আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 'বালিশ কাণ্ড' পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই মনে আছে। ঘটনাটা আরো হাজার হাজার 'নতুন কাণ্ডে' চাপা পড়ে গেছে। একটা বালিশ নিচতলা থেকে ওপরতলায় ওঠাতে খরচ লেগেছিল মোটামুটি আট'শ টাকা। এরকম প্রতিটা জাজিম আনতে ট্রাক ভাড়া লেগেছিল কয়েক হাজার টাকা (সঠিক তথ্যটা এতদিনে ভুলে গেছি)। এমনি লাখ লাখ 'বালিশ কাণ্ড' এদেশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। কোষাগারে কুলোবে কতক্ষণ! প্রতিটা সেক্টরে একই

অবস্থা। কোনটা রেখে কোনটা বলবো। এদেশে 'জন্মই আমাদের আজন্ম পাপ'। যারা স্বেচ্ছায় কর দেন বা কর দিতে বাধ্য হন, তারা করের ভারে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছেন– এটা নিরঙ্কুশ সত্য। কোন দেশে করের হার কত, এই বয়ান আমার সামনে কেউ না করতে বিনীত অনুরোধ করছি। যাহোক, পাপের কথা কম বলে পুণ্যের কাজের কথা বলি।

ছোটবেলায় রামপ্রসাদি গান শুনেছিলাম, 'মক্কা-কাশি শ্রীবৃন্দাবন, অকারণ ঘুরে ঘুরে মরণ, আগে নিজের স্বভাব সুন্দর কর, তারপর ...'। রাজনীতির দেশীয় স্বভাব ভালো নয়। খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে দেশসেবা ও সমাজসেবার নামে রাজনীতি করি। স্বভাবটা আগে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রশাসনিক দক্ষতা দেশ-উন্নয়নের উপযুক্ত হতে হবে। উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ব্যয় করার আগে 'যথার্থতা অডিট', যাকে বলে 'যথাযথতা অডিট' (প্রোপ্রাইটি অডিট) এক বা একাধিক সৎ ও যোগ্য টিমের মাধ্যমে করাতে হবে। টিমের সদস্যরা রাজনীতিক কিংবা তোষামোদকারী হবেন না। অতপর টিমের নির্দেশনায় বরাদ্দের টাকা ছাড় করতে হবে। এতে কোষাগার থেকে একশ টাকা ব্যয় করলে দেশ একশ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন করবে। অনেকে অবৈধ টাকা অর্জন করে কর ফাঁকি দিচ্ছে, কখনো টাকা বিদেশে পাচার করছে। এ অবৈধ টাকা দিয়ে দেশে কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠান তৈরি করলেও অনেক বেকারের কর্মসংস্থান হয়। অথচ কালো টাকা সাদা করার ব্যবস্থা আছে। কর কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না, টেকনোলজির এমন উৎকর্ষের যুগে কর ফাঁকিবাজ ধরার উপযুক্ত পদ্ধতির অভাব নেই। প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট মহলের সদিচ্ছা; এছাড়া কর ও শুল্ক প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো দরকার। বেড়ায় খেত খেয়ে গেলে সে খেত পাহারা দেবার কেউ থাকে না। এদেশে কর কারো জীবনব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে ছাড়ছে, কেউবা কর ফাঁকি দিয়ে কিংবা অবৈধ রোজগার করে আরাম আয়েশে দিন কাটাচ্ছে এবং সমাজে ফাঁকিবাজ, দুর্নীতিবাজরা কদর ও সম্মান বেশি পাচ্ছে। আমরা মুখে মুখে সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছি, কাজে করছি তার বিপরীত। এই বৈপরীত্যের মাঝখানে পড়ে গেছে জনসাধারণ। মূলত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সৎ লোকের জন্য এদেশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। অনেক সহকর্মী ও সাধারণ লোকের মুখে সে বার্তা শুনতেও পাচ্ছি। কোনো দেশের দেশ-পরিচালকরা যদি সাধারণ মানুষের প্রতি সদয় না হন, সাধারণ মানুষের আর কোনো অবলম্বন থাকে না। এবারের বাজেট দেখলে তাই মনে হয়। সম্ভবত পঁয়ষট্টি সালে রেডিওতে একটা গান শুনেছিলাম, করের ভার দেখে গানটা আজো মনে পড়ে। কথাগুলো এ-রকম: 'ও সোনার ময়না রে, চলো এ দেশ ছেড়ে আপন দেশে যাই। হেথায় আছে রে এক কুলের মায়া, হেথায় আপন বলতে কেহই নাই, চলো এ দেশ ছেড়ে ...'।

এখন থেকে দিন যত ঘনিয়ে আসবে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ করে অতীত ঋণের টাকা সুদাসলে কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। এটাই এদেশের সামনে কঠিন বাস্তবতা। কোবাদ আলী মণ্ডলের শেষ বয়সে এসে এমনটিই হয়েছিল।

(১৪ জুন ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।